শ্রীমতী কবিতা ভট্টাচার্যকে

সূচীপত্র

তৃতীয় নয়ন

হে মৃত্যু হে অন্ধকার
তৃতীয় নয়ন থেকে প্রত্যহ তোমার
আবির্ভাব দুই চোখে ঘুমন্ত রাত্রির স্বাদ হয়ে।
রোজ রোজ এই চোখে মৃত্যুর মধুর দীক্ষা লয়ে
হব একদিন আর না-জাগার তৃতীয় নয়ন।
পৃথিবীর এই জাগরণ
অতীতের সোমলতা, দূরান্তের আঙুরের দেহে
কিম্বা তাল খেজুরের মহুয়ার স্নেহে
ভালবেসে সেই তৃতীয়কে
ঘুমকে ডেকেছে দুই চোখে।
হয়তো ঘুমেরই খোঁজে
পৃথিবীর যুগলেরা চোখে চোখ রেখে চোখ বোজে
এ চোখের সব সমর্পন
তুলে নেয়, ডেকে নেয় তৃতীয় নয়ন ॥

১৭. ২. ১৯৪৫

ঘুমের দেশ

ব্যথা আর বেদনায়
ঘুমেরা পালিয়ে যায়
ঘুম নেই।
এসো ঘুম, এসো ঘুম
আমাকে তোমার হাতে দেই।
ঘুম নেই।
কোথায় ঘুমের দেশ
ঘুমের আকাশে ছাওয়া দেশ,
যেখানে ঘুমের রেশ
কুয়াসা বিছায় চারিধার,
যেখানে ঘুমায় ঘুম আর
ঘুমের ঘুমন্ত শিশু
স্বপ্ন দেখে অনন্ত ঘুমের,
যেই ঘুম নির্বাণের, পরম শূন্যের,
সেই ঘুম আমাতে আস্থক
দুচোখে নামুক।
এসো ঘুম, এসো ঘুম
আর-না-জাগার সেই ঘুম।

১, ১১, ১৯৪৮

তারপর

যত জানি কী হয়েছে,
তারপর কী রয়েছে
সব চাই জানতেই
গল্পেরো শেষ নেই
আমাদের দিন রাত্রি মাস
হয়তো তেমনি উপন্যাস।
তারপর তারপর···
কী জানি কী উত্তর
সতর্ক প্রতীক্ষায়
জানার নেশায়
কাহিনীর পাতা উল্‌টাই,
সুখ পাই, দুঃখ পাই,
পাতায় পাতায় তবু এক কৌতুহল
কেবল চঞ্চল।
আমাদের দিন রাত্রি সুখেদুখে ভরা
হয়তো তেমনি এক উপন্যাস পড়া।
এই গল্পে সব চেয়ে রহস্যের রাণী
এসো মৃত্যু তোমাকেও জানি।

২১, ৩, ১৯৫৪

আমি

কেন এলাম, কেনই আছি, কেনবা চলে যাব।
জানিনা আমি জানিনা। তবু আমি যে বেঁচে আছি
সেটুকু জানি। তাওতো রোজ ঘুমের কাছাকাছি
ভুলতে যাই। কী ক'রে তবে নিজের খোঁজ পাব?

তবে কি আমি এসেছি কোনো ঘুমের দেশ থেকে?
রোজ কি তাই সে-ঘুমে চলি? শেষ নিরুদ্দেশে
ফের কি আমি হারিয়ে যাব, সেই ঘুমের দেশে?
কী হয় তবে নিজেকে এই জাগার দেশে রেখে?

অথবা আমি জাগৃতিই, নিত্য জাগরিত!
এমন দেশে ছিলাম আমি, যেখানে ঘুম নেই;
সেই জগতে আবার যাব, ছিলাম যে-লোকেই;
ঘুমের টানে এখানে এসে ঘুমে জজরিত!

কে আমি তবে, কী আমি তবে, ঘুম কি জাগরণ?
এখানে আমি জেগেও থাকি, ঘুমেও চলে পড়ি;
এখানে আমি জন্মি; ফের এখানে আমি মরি;
আগু ও পিছু কী দিয়ে ভরা, জীবন কি মরণ?

হয়তো আমি জাগৃতিই, ঘুমে জর্জরিত
যে-কটা দিন মর্তবাসী। তবে সুষুপ্তিকে
দু'হাতে ঠেলি; ঘুমকে ভুলি। ঘুমের পরিধিকে
স্বপ্ন দিয়ে জাগার মত রাখব মুখরিত॥

১৮, ১০, ১৯৫৫

বয়ম্

মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে বাঁচি।
সফেন সমুদ্রে কেউ
কোনো এক ঢেউ
হারিয়ে যাবার আগে আছি।

ঢলবার গলবার আগে
আকাশের অনুরাগে
উচ্ছ্বাসে এই উত্থান
যদি হয় স্তম্ভিত পাষাণ
পাহাড়ের ঢেউ হয়ে বাঁচি।

অথবা সমুদ্রে যদি
সব ঢেউ মরে গিয়ে নিরবধি
সরোবর হয়,
তবে সেই তন্ময়
অন্য কেউ হয়ে গিয়ে সব ঢেউ বাঁচি।

সেই অন্য কেউ যদি সকলের আমি,
সেই সরোবর যদি সন্তবামি
সমুদ্রের এত ঢেউ হয়ে থাকে,
কে আর হিসাব রাখে
ঢেউদের ওঠা-পড়া
জন্ম-মৃত্যু, ভাঙা গড়া
যেহেতু আমি না থাকি, আমরা তো বাঁচি

৮, ৩, ১৯৫৫

পোষ্টকার্ড

চিঠি লিখি, নিজের কুশল
কেমন লাগছে আর কেমনই বা আছি
তাছাড়া আর যা সব ঘটেছে আমার কাছাকাছি
এই সব খবর কেবল।

খুব ছোট পোষ্টকার্ড, খুব কম আয়ু
এতটুকু কপালের মত
যতকথা আছে তার ঠাঁই নেই তত
এতটুকু পালে যেন এক আকাশ বায়ু।

বাড়ীতে লিখছি চিঠি, জানিনা কোথায় সেই বাড়ী
কোন্ কালে, কোন্ তীরে
কোন্ মানুষের ভীড়ে
কোন্ ঠিকানায় এই চিঠি দেবে পাড়ি।
তিন তুড়ি দেয়া এই তিন পয়সার
ছোট কার্ড ভরে যায় তিনটি কথায়।
ত্রিমূর্তির নীচে তবু এত জায়গায়
কী হদিশ দেই ঠিকানার!

১৫. ১. ১৯৫৫

কথা

ঘরোয়া বুকের কথা মুখের দরজায়
এসে এসে ঠোঁটের চৌকাঠে
স্থির পায়ে ছবি হয়ে যায়,
নামবার সিঁড়ি নেই, অন্দরের খাটে
অজ্ঞাত শয্যার পর
দুয়ারেই কথা এলো যদি
নেই নেই নামবার নিরন্তর
কানে কানে সিঁড়ি নিরবধি।

সম্মুখের ঘাটে নেই
নিস্তরঙ্গ দীঘি এই বেলা।
শ্যাওলায় নখাগ্র টেনেই
ব্যাঙাচির কানামাছি খেলা
দীঘির গলিত চোখে চলে।
চৌকাঠের কান্না
এমনি বধির জলে
কী করে ফেলবে তার ছায়া?

৫, ১১, ১৯৫৫

জন্মান্তর

আমি মরতে চাইনা। কী করে থাকব!
বুকের স্পন্দন থেমে গেলে কী করে রাখব
তার রেশ। তোমার বুকেও তার
প্রতিধ্বনি রাখবার
আয়ু শেষ হলে কোন্ ঠাঁই
সুর হয়ে যাই?
কোন্ তানপুরার যন্ত্রটি
আমাদের ঘরানার মন্ত্রটি
বাঁচাবে, তাকেই এসো ডাকি,
তারি ধ্যানে বুকে বুক রাখি।
তোমার আমার চোখ বুজে গেলে
যার দুই চোখ মেলে
তাকাব তাকেই এসো ডাকি,
তারি ধ্যানে চোখে চোখ রাখি।

আরেক প্রাণে জ্বলব বলে
তোমার কাছে আসি
আরেক প্রাণে নামবো বলে
তোমায় ভালবাসি।
তোমার কাছে ছন্দ হতে
এমনি কাছে আসা।
নতুন প্রাণে গান হব তাই
আমার ভালবাসা।

৯, ৩, ১৯৫৫

ভালবাসি

অনেক সুন্দর আছে পৃথিবীতে। তবু আমি দুচোখ ফিরাই
কেবল তোমার দিকে। অনেক সুরেলা কণ্ঠ মৃদু রোশনাই
হিমেল বাতাসে ঢালে। তবু আমি তোমারি ডাকের প্রতীক্ষায়
কান পেতে থাকি আর তোমাকেই ডাকি শুধু প্রানের কান্নায়।

এ কি প্রেম ? এই অন্ধ পক্ষপাত যদি প্রেম, যদি ভালবাসা,
এই ভালো, এই বেশ ভালো তবে। উদয়ের সূর্যও পূর্বাশা
এই অন্ধ পক্ষপাতে খোঁজে, আর নিয়তির মত ভালবেসে
বাষ্প ওড়ে, মেঘ ঘামে, হিম গলে, নদী নামে একক উদ্দেশে।

আমিও এমনি পরিনামের মতন শুধু তুমি হতে চাই।
অন্ধপক্ষপাতে খুঁজি অসংখ্যের মধ্যে শুধু তোমাকে একাই।
দূরে আছি, তবুও তোমার আছি। তুমিও কি তোমার নিঃশ্বাসে
ছুঁয়ে আছ দূরান্তের আমাকেই, ধ্রুব করে তোমার আকাশে ?

দিনের আলোক ছুঁয়ে ভাবছ কি আমি সেই আলোক সংলগ্ন
যদি ও অনেক দূরে ? আরো দূরে যদি চলে যাই, মৃত্যু মগ্ন
নিস্তব্ধের অন্ধকারে হারাই, তখনো তবু আমারি উদ্দেশে
আকাশ প্রদীপ জ্বেলে রবে তুমি ভালবাসাটাকে ভালবেসে ?

আমারি জন্য তবে ঐ প্রান অথৈ বুকের নামতায়
দ্বিগুন চৌগুনে নাও আমাকেই। ঝাপতালে কিম্বা দাদরায়
স্নায়ুর সেতারে তুমি আমাকে বাজাও। আমি স্বরলিপি এই
তোমারি সুরের স্রোতে গলি। আর মিশে যাই আমি তোমাতেই

ঐ মনে আমি যদি, তবে আর তুমি নেই, আমিই সেখানে
চোখের সন্ধানে আছি, বুকের স্পন্দনে আছি। আর গানে গানে

স্নায়ুতেই বাজি আর সব আমি তুমি হ'য়ে ঐ ঠোঁটে হাসি।
ঐ চোখে চেয়ে থাকি। ঐ খানে আমাকেই আমি ভালবাসি।

তুমি নেই, আমি নেই অতল অকূল এক সমুদ্র কেবল—
ভালবাসা তার নাম। তুমি ঢেউ, আমি ঢেউ। তুমিই উচ্ছল
এলিয়ে পড়ার সঙ্গে আমার উচ্ছ্বাসে জেগে ওঠ। বারেবারে
সমুদ্রের এক বিন্দু জুড়ে তুমি নিরন্তর জাগাও আমারে।

আমি নেই আমি নেই, তোমাকেই বারবার আমাতে জাগাই
তোমারি ঢেউ-এর ছন্দ, তোমারি আনন্দ আর তোমার কান্নাই।
তুমি নেই, তুমি নেই তুমিও তো আমি হয়ে ওঠ। আছে এই
সমুদ্রই। ভালবাসা তারনাম। ভালবাসি ভালবাসাকেই।

১৯.১১.১৯৫৫

দেখো, শোনা

আমাকে কোথায় দেখো ? দেহের ভঙ্গীতে
সুন্দরের দেখাতো পাবেনা। পরিধিতে
কতটুকু থাকে ? তুমি তাকাও ভিতরে।
সেখানে সুন্দর আমি, ছবি সুরে ঝরে।
সেখানে যায়না চোখ। চেয়ে দেখো যদি
অন্য চোখ থাকে। দেখো তাকে নিরবধি
যে জন ভিতর থেকে এত ভালবাসে ;
আর তারি স্পর্শ নাও আমার নিঃশ্বাসে।

দেখো তাকে। সেই ছবি একখানি গান,
দুই কানে পাবেনা তো তাকে। অন্য কান
থাকে যদি, আমারি নিঃশ্বাসে শোনো তাকে,
প্রবাসী আকাশ পাড়ি দিয়ে যে তোমাকে
দূর বন গন্ধ হয়ে ছোঁয়। এই নাকে
পাবেনাতো। নাও যদি অন্য নাক থাকে।

২৩, ১১, ১৯৫৫

হাতে হাত রেখে

সেই স্বরলিপি দিয়ে কী হবে আমার
সুরের আলাপে যদি তন্ময়তার
মোহনায় নাই নিয়ে যাবে !
যদি প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র না জাগাবে
মর্ত্যের মাটির প্রতিমায়
কী হবে আমার সেই পুতুল খেলায় !

হোক শ্বেত পাথরের, চন্দন কাঠের
কিম্বা কৃষ্ণনগরের শিল্পীর ছাঁচের
তবু তা পুতুল খেলা প্রতিমার নামে
প্রাণ যদি সেখানে না নামে।
কী হবে আমার সেই পুতুল খেলায়
মন্ত্র যদি ব্যর্থ হয় এই প্রতিমায় !

কবিতার ছন্দ আর মাত্রা আর তালে
ধ্বনির আড়ম্বরে মিলের জঞ্জালে
কিছু যদি নাই পাই অনুভাবনায়
কী হবে আমার বল সেই কবিতায় !
তরঙ্গিত তনুরেখা কী দেবে আমাকে
ভালবাসা সেই তীর্থে নাই যদি থাকে !

হাতে হাত রেখে দিলে কতটুকু আসে আর যায়
প্রাণে যদি প্রাণ আর মনে যদি মন না মেশায় !
কী হবে আমার এই হাতে হাত পেয়ে
হাত তুলে নিলে যদি সেই প্রাণ ছেয়ে

কোন আর কিছু নাই থাকে
মনে যদি না পায় আমাকে।

আমি যদি দূরে থাকি
সহজ নিঃশ্বাসে তার ছেদ পড়ে নাকি
জল থেকে তুলে আনা মাছের মতন
কিম্বা শীতের দেশে চাতক যেমন
শুধু বর্ষারই পিপাসায়
কোনো শূন্যে ডানা ঝাপটায়।
আমি যদি দূরে থাকি
সহজ নিঃশ্বাসে তার ছেদ পড়ে নাকি ?

আমি যদি দূরে যাই
এতদূর দেশে যার কাছ থেকে কেহ ফেরে নাই—
আমার স্মৃতিকে নিয়ে মিটবে কি স্নায়ুর পিপাসা ?
আমাকে হারিয়ে তবু ভালবেসে সেই ভালবাসা ?
তখন কিছুই যদি সেখানে না থাকে
কেন তবে হাত রাখে
আমার নশ্বর এই হাতে
কিছুই না পাই যদি সে হাতের সাথে !

২৮, ১২, ১৯৫৪

মাঠের সম্রাট

অনেক এগিয়ে এলে
কাহিনীর কোল ফেলে
অনেক আকাশ পেছে রেখে
এসেছ অনেক ধূলি মেখে।

কাঁটা-পথ ধূলিঝড়
গোচারণ প্রান্তর
পলি-জমা সমতট উপকূল ভূঁয়ে ভূঁয়ে
এসেছ অনেক ঘাট ছুঁয়ে।

অনেক বিন্ধ্যাচলে চরণের ধূলি দিয়ে
অভিযাত্রীরা এলে এগিয়ে
যৌথ পায়ের পথে হেঁটে ;
অনেক একুশ বার
অনেক পরশু-ধার
পরখ করেছ বন কেটে।

হাজার হাজার যুগ কঠিন স্পর্শে তব
পাষাণ জমিকে দিলে প্রাণ
আরুণীর বাঁধ দিয়ে রুদ্ধ অনেক ঢল
বন্দী বন্যা আর বান।
দূরের গঙ্গা স্রোত খরায় এনেছ খালে
লক্ষ জমির আলে আলে ;
অশেষ অযুত সংগ্রামে
থেমেছ আজের কোটি গ্রামে।

অনেক পাহাড় আর
অনেক নদীর ধার
অনেক মরুর মাঠ দিয়ে
ইতিহাসে এলে এগিয়ে।
বন্ধুর পাহাড়িয়া কংকর
দুর্গম অরণ্য মর্মর
ডিঙিয়ে অনেক মরুভূমি
সুদূর ধূসর মাঠ চুমি
এগিয়ে এসেছ বহুদূরে ;
কঠিন মাটিকে খুঁড়ে
সীতায় তুলেছ ইতিহাস
লাঙলে এনেছ আশ্বাস।

কত অধ্যায় শেষে
অজস্র পরিবেশে
বিপর্যয়ের পরাজয়ে
এসেছ জয়ের টীকা লয়ে।
একটানা সংগ্রামে
প্রতিকূলতারা থামে
একটানা শ্রমে দিয়ে দাম—
অনেক শ্রান্তি আর ঘাম।
অশেষ সোনালী ধানে
মাটি নজরানা আনে
সেলামী জানায় কোটি মাঠ
হালের দণ্ড ধরে
মাঠেরে শাসন করে
আজের মাঠের সম্রাট।

২০, ১০, ১৯৪৫

স্বকীয়া

দূরের সবুজ-নীল দিগন্ত সেখানে
পাখীর পাখার গানে
আমাকে বাহিরে ডেকে-ডেকে,
কুয়াসার ঘোমটায় আজ মুখ ঢেকে
শীত-শীত এই সন্ধ্যায়
আমাকে ঘরের দিকে কেবলি ফেরায়-
যেখানে সবুজ সাড়ী নীলাম্বরী পাড়
ঘোমটায় দেয় আড়
আরো এক মিষ্টি কুয়াসাকে।
সেই ঘর ডেকেছে আমাকে।

৬.১১.১৯৫৪

এই মন

ইন্দ্রিয়ের সিংহাসনে ইন্দ্র এই মন
ময়ূরের মত পাখা মেলে
মেঘ-কণ্ঠে ডাক দেয়
ডাকে নব জলধর শ্যামে।
নীল মেঘ তাঁবু ফেলে মনের আকাশে
পেখমের গায়ে গায়ে
ইন্দ্রধনুর ছবি আঁকে।

কুয়াসায় দিক দেশ সব ঢেকে গেলে
সব রং জ্বলে গেলে ঝরে গেলে পরে
অপার কুয়াসা ছাওয়া শূন্যের সাগরে
আমিই বরুণ, করি আমাকে প্রণাম।
ফিরে আসি নেমে আসি ময়ূরের ডাকে
নব জলধর শ্যামে, মনের আকাশে
ইন্দ্রিয়ের সিংহাসনে পেখমের গায়ে
ইন্দ্রধনুর ছবি হয়ে।

হয়তো কখনো প্রাণ-বসন্তের দেশে
নব দুর্বাদল শ্যামে, সবুজ জোয়ারে
সোনার হরিণ হয়ে
বাতাসের ক্ষিপ্রতায় ছুটি।
কখনো বা মুখ ঘসি আশীর্বাদী রঙে
ঝড়ের আগের কোনো স্তব্ধতায়।

২৮, ১২,১৯[illegible]

দিকপাল

দূর উত্তরে কোন্ সে ঘোড়-সওয়ার
সীমান্ত ছেড়ে সীমান্ত হয় পার।
অশ্বের হ্রেষা ক্ষুরের ক্ষিপ্র ধ্বনি
উত্তর থেকে উত্তরে তোলপাড়।
যেন দক্ষিণা বায়ুর পৃষ্ঠে চেপে
ফুলেল গন্ধে দিক দিগন্ত ব্যেপে
কুবের রাজার বারেন্দ্র-অভিসার।
হিমেল বাতাস আবার উল্টোরথে
মহিষের পায়ে পাতা ঝরা পথে পথে
খোঁজে রাঢ় ভূমে যমের দখিণ-দ্বার।

শীত-বসন্তে দক্ষিণে উত্তরে
রাঢ়ে-বরেন্দ্রে কারা ভাঙে, কারা গড়ে।
কোন সওয়ারের কোন আগমনী আনে
মহিষের পায়ে, ঘোড়ার খুরের ঝড়ে।
তবু প্রত্যহ পূবের উদয়াচলে
আলোর ঐরাবতের শুণ্ড দোলে
অস্ত-পাতালে কুমীর দেয় সাঁতার।
পূর্ব-তোরণে ঐরাবতের কাঁধে
ইন্দ্র হাজার চোখ মেলে আহ্লাদে
বরুণ উধাও পশ্চিম পারাবার।
ইন্দ্রধনুতে পূবের রংবাহার
পশ্চিমে শুধু নেতি নেতি নিরাকার।

উদয়-অস্তে পূবে-পশ্চিমে রোজ
দেখি জীবনের ওঠা নামা বার বার।
যমের দখিণ দরজায় পিঠ রেখে
উত্তরাস্যে জীবনকে ডেকে ডেকে
দেখি ডানে বাঁয়ে উদয়-অন্ধকার।
দিকভ্রান্তেরা বিপথের গ্রাক শোনে
কখনো অগ্নি, কখনো বা বায়ু কোণে
নৈঋতে আর ঈশানে মরীচিকার।

১, ২, ১৯ ৫৫

শুক্লার প্রথমা

একফালি বাঁকা চাঁদ দাঁড়ানো।
শুক্লার প্রথমার সূচনার সংকেতে
প্রাণের আভাস দ্যুতি জাগানো।
আকাশের বুকে তার আকুতি
প্রকাশের বিকাশের কাকুতি
বাড়ন্ত বৃদ্ধির মাত্রা—
পায়ে পায়ে পূর্ণিমা যাত্রা,
তলে তিলে সুষমায়
নন্দিত মহিমায়
আলোকের আয়তনে আগানো।
তারপর জ্যোৎস্নায়
আলোকের বন্যায়
চরম খুশীর দেশে দাঁড়ানো।

আবার ক্ষয়ের সাথে সংগ্রাম,
তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া নবযাম
অন্ধকারের অভিসার।
ছম্‌ছম্‌ শঙ্কায় দিক্‌দেশ নিঃঝুম
প্যাঁচার ডানায় কাঁপে হিমমৃত্যুর ঘুম
দীর্ঘ দীর্ঘ বিস্তার।
রাতের রুদ্ধশ্বাস জমাট অন্ধকারে
আলোকের ইস্পাতী তির্যক প্রহারে
বুক চিড়ে বোবা মৃত্যুর
জ্বলন্ত অংকুর

মৃত্যুঞ্জয়ী আহ্লাদ—
আবার সে প্রথমার চাঁদ !
বারে বারে প্রথমার নূতনের দীক্ষায়
বার মাস কেটে যায়।

সূর্যের, রুদ্রের ক্রোধান্ধ হুকুমৎ
উৎকট অসহ্য চাইনা
ক্রোধ উপচানো রূপ চাইনা।
স্থূর সূর্যের পায়
প্রচণ্ড হলকায়
মরুভূ'র ধূলি হয়ে ধুকতে
চাইনাকো ঝলসাতে জ্বলতে।
চঞ্চল চন্দ্রের বলানো সে সুষমায়
অনন্ত লাস্যে ও হাস্যে
মুখরিত জীবনের ভাষ্যে
শান্তির বিশ্বাসী সত্তা
দোলাও আকাশী নীল ওড়না।
সেখানে থাকুক আঁকা
ধ্রুব তারা কোলে রাখা
সূচনার সংকেতে প্রথমা,
তিলে তিলে বাড়ন্ত সুষমা।

১০. ৮. ১৯৫৪

এই মরা কার্তিকে

এই মরা কার্তিকে গাছের ডগায়
কারা সব রোজ রোজ আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে যায়
সময়ের যেন দূরবীন।
হয়তো বা ফিরবেনা দেয়ালীর দিন।

এসব সবুজপাতা, টিয়ার পালক ঝরে যাবে
অন্ধকারে কুয়াসায় এগাছ দাঁড়াবে
হরিণের শিং তুলে বাঘের থাবায়।
কারা তবু রোজ রোজ আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে যায়।

কুয়াসায় নিবু-নিবু এই তারা-ভরা
আকাশের নীচে যত জোনাকীর ছড়া
হবে নাকি তারাবাতি, আলোর হাউই,
আকাশকে ক'রে ছুঁই-ছুঁই
ঠাঁই কি পাবেনা ঐ আকাশের গায়
চাঁদ হয়ে ভরা জ্যোৎস্নায়!

এই মরা কার্তিক এই তো সেদিন
আকাশ-প্রদীপে সাল তামামির ঋণ
শুধেছিল কার্তিকের পায়;
তারপর মার্গশীর্ষ অগ্রাণের সে হাল খাতায়
সিদ্ধিদাতা গনেশের নামে
আমনের নবান্নের সোনালী প্রণামে
এনেছিল নতুন বছর।
অনেক, অনেক যুগ পর

এই মরা কার্তিকে গাছের ডগায়
কারা আজ শুধু শুধু আকাশ প্রদীপ জ্বেলে যায়!

এখনো কি আছে তারা, সেদিনের সেসব মানুষ?
সেই সব প্রেতাত্মা নহুষ
এখনো কি নেমে আসে তর্পনের জল নিতে
কার্তিকের এই পৃথিবীতে?
মর্ত্যের পথ যদি তাঁরা ভুলে যায়—
কারা তবে শুধু শুধু আকাশ প্রদীপ জ্বেলে যায়!

২. ১১, ১৯৫৪

কার্তিকের পর

আকাশ প্রদীপ জ্বেলে কার্তিকের সংক্রান্তি ডিঙিয়ে
সিদ্ধিদাতা গনেশের নাম নিয়ে-নিয়ে
অগ্রাণের আমনের হালখাতা খুলে
কালের বন্দর ছাড়ি খেয়া পাল তুলে।

কুয়াসায় কুয়াসায়
ধূপের ধোঁয়ায়
দেবদাসী-নৃত্যে মাতে
ধূমাবতী হিমরাতে
রাত্রির পৃথিবী কালো মেয়ে।
লক্ষ্মী আসে মাঠ ছেয়ে
দূরে ঠেলে সব সর্বনাশ
গোলাভরা সেই পৌষমাস ঃ
সংক্রান্তির পিঠার পার্বণ—
নবান্নের সোনালী স্বপন !

পাতা ঝরা গাছের তলায়
হাজার রোদের এক নামাবলী গায়
বৈরাগী মাঠ শুয়ে থাকে
তেপান্তরের বাঁকে বাঁকে।
তারপর অনাহত বীণা বাজে দূরে
মাঘের পলাশ বনে বসন্তের সুরে
আনে কচি কিশলয়ে নতুন মর্মর
সরস্বতীর বাণী, কথা ও অক্ষর।
কুয়াসায় কুয়াসায় ধূপের ধোঁয়ায়
পৃথিবীর আরতি কি সেখানে পৌঁছায় ?

১৪. ১১. ১৯৫৪

মন ময়ূর

নবদূর্বাদল শ্যামে সোনার হরিণ বাঁচে মরে।
আমাকে ময়ূর কর, সুনীল অম্বরে
নবজলধর শ্যাম দেখি
চোখে নীল অঞ্জন লেখি।

ঘাড় গুঁজে মুখ ঘসে হরিণের মত
বাঁচবোনা। গ্রীবা তাই উদ্ধত
ঊর্ধ্বের আহ্বানে সাড়া দেয়—কেগা।
দে জল, দে জল, দেগা
চাতকের তৃষ্ণার সুর।
আমাকে ময়ূর কর, আমাকে ময়ূর।

পাতা বাহারের
ফুল শয্যার রংদোলে মদনের
বসন্ত বাহার
মদনমোহন মেঘমল্লারে যাক অভিসার।
কুহু নয়, কুহু নয়
আমাকে কেকায় কর তন্ময়।

১০, ৩, ১৯৫৫

দিব্যজন্ম

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস'।
নিঃশ্বাস প্রাণের ধর্ম, প্রাণগুলি সাপ
ভালবাসে ফুল, গান
তবু বিষধর।
সাপের স্বপ্নের পর
বংশধরগুলি শুধু সাপ-অবতার
নাভির পাতালবাসী।

নাভির উর্ধের এই হৃদয়-আকাশ।
সেখানে যখন
নভোচারী গরুড়ের পাখার স্বনন
স্পষ্ট হবে,
হয়তো তখনি যত নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস
থেমে যাবে।
হে আকাশ মুখরিত হও
গরুড়ের পাখার স্পন্দনে।

কিম্বা ময়ূর তুমি আকাশের পরিচয় চাও
কেগা কেগা, কেগা।
বিষাক্ত সাপের কণ্ঠে নখ দিয়ে
খোঁজ মেঘে আলোকের সাপ।
ডমরুর তালে তালে কোন্ সাপুড়িয়া
তাদেরে খেলায়।
তুমিও তাদেরি মত অগ্নিশিশু হও।

২৫. ২, ১৯৫৫

রবিবার

গীর্জার চূড়ায় বাজে মুয়েজ্জিন ঘণ্টার আজান
ক্রুশে কম্পমান
ম্লান রেশ।
জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সংক্লেশ
সিঁড়িতে পায়ের ছাপ রাখে
রবিবারে। রাস্তার ধূলি ঢাকে
সেই সব ছাপ অন্যদিন;
আদম-ইভের ঋণ
চক্রবৃদ্ধি হারে
রোজ বাড়ে।

কালো তারিখের গাছে কয়েকটি বিরল
লাল উজ্জ্বল
হাসি খুশি রবিবার আসে।
পূবের আকাশে
বাসি চোখে জোড়-হাত প্রণাম পাঠিয়ে
ইতুর উপোসী হাত দুধ-জল দিয়ে
সন্ধ্যায় ধুয়ে দেয় কালো শিব-শিলা,
কালো পাথরের ক্রুশ। এই নিকুম্ভিলা
এই নিস্ফল ব্রত চড়কের ক্রুশের মাথায়
তবু এক যন্ত্রণার নিশান ওড়ায়।

২, ৩, ১৯৫৫

জলকন্যা

বিবসনা, তীরে ওঠো। ওঠো জল থেকে
এক হাতে ভরা বুক, এক হাতে কটি-তট ঢেকে
কালো চুল পেছনে ছড়িয়ে
আপনাকে লজ্জায় জড়িয়ে
তীরে ওঠো। সম্মুখের
শাড়ীর প্রহরী মুক বিশাল গাছের
শিহরণ আনো তার প্রাণের শিকড়ে।
স্বেদ-কম্পে পুলকিত ফুলের কেশরে
জানুক সে নিজেরে জানুক।
এক পায়ে খাড়া, তবু নিজেরে মানুক
স্থানু নয়, প্রাণের প্রদীপ।
বিবসনা তীরে ওঠো। এসো, এসো গাছের সমীপ

ওঠো বিবসনা গোপী, ওঠো সাগরিকা উর্বশী
প্রলয়-পয়োধি থেকে। স্রষ্টার মানসী,
প্রাণের রোমাঞ্চ আনো তৃণে, দূর্বাদলে,
অরণ্যের ফুলে আর ফলে।

২২, ৬, ১৯৫৫

স্বর্গের সিঁড়ি

এত বড়, এতউঁচু, এত দোল পিঁড়ি
পাহাড়ে সাজানো। আর স্বর্গের সিঁড়ি
ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে মেঘ কুয়াসায়
হারালো কি? আবডালে অথই ঝোরায়
গঙ্গাই নামছেকি? আমি কোন্ ঠাটে?
পিঁড়ির সিঁড়িতে কিম্বা আকাশ গঙ্গার একঘাটে?

এখানে কে হাঁটে? এই সিঁড়ি বেয়ে কোন্ গোপী ওঠে
গঙ্গার কোন্ ঢেউ নামে? আর দুই চোখে ফোটে
ভরাট ভূগোল-মুখে ভুঁইচাপা উঁকী। এই ভরা দেশে
গম্বুজের পাখোয়াজ ভাস্কর্যের রেশে
এই পথে নামে আর ওঠে। আমি কোন্ ঠাটে?
পিঁড়ির সিঁড়িতে কিম্বা আকাশ গঙ্গার এক ঘাটে?

৯, ৭, ১৯৫৫

সাগরে পাহাড়ে

দূরদক্ষিনে গঙ্গাসাগরে যমের দখিন দ্বারে
ঢেউ উঠে উঠে শুধু ভেঙে ভেঙে পড়ে।
মৃত্যুমুখর নাস্তির দেশ নীল মহানির্বান
প্রলয়নৃত্যে নেতি নেতি জপ করে।

এই উত্তরে উত্তরাপথে ধ্যানাসীন মূর্তিতে
স্তম্ভিত গিরিতরঙ্গ ভঙ্গিমা
দার্জিলিঙের মহাকাল থেকে জয়ন্তীমহাকালে
ভাস্কর্যের কালজয়ী মাধুরিমা।

এই মহাকাল বিগ্রহে, চালচিত্রের পরিধিতে
নেপাল সিকিম ভোটান চন্দ্রমালা
ছায়া দেখে দূর গঙ্গাসাগরে উত্তাল নীল জলে
যেখানে আন্দামানের প্রদীপ জ্বালা।

সাগর পাঠায় দখিনা বাতাস উত্তর পর্বতে
কালের পূজার ফুলে ও পাখীর গানে
মহাকাল থেকে আশীর্বাদের নদনদী নেমে আসে
উত্তরবায়ু কখনো শাসন আনে।

মৃত্যু মথিত সাগরের ঢেউ পাহাড়ের শৃঙ্গতে
স্তম্ভিত হয়ে অনন্তকাল বাঁচে।
ধ্যানবিগ্রহ মহাকাল তবু সাগরের দর্পণে
চিরচঞ্চল নটরাজ হয়ে নাচে।

২, ৬, ১৯৫৫ ৲

উত্তর ত্রিবেনী

বান-ডাকা এই তিস্তায় জল আস্তে যাও
এত দেশ ঘুরে যেতে পারবনা, রাস্তা দাও।
মংপুর রীং নদীর মতন তিস্তা কেটে
রিলি'র উজান স্রোত হ'য়ে এই পাহাড় হেঁটে
যাব পাহাড়ের পূব পাড়া। যেতে রাস্তা দাও।
বান-ডাকা এই তিস্তায় জল আস্তে যাও।

তিস্তার তীরে রিয়াং-এর এই পাহাড়ী গাঁয়ে
নামে তিব্বতী মন্ত্রের ঝড় স্রোতের ঘায়ে।
মংপু'র রীং তবু রবীন্দ্র সঙ্গীতেই
দেখছে রিলি'র চর্যাপদের ভঙ্গীকেই।
আমি যাব ঐ রিলির ঝোরায়, রাস্তা দাও
বান-ডাকা এই তিস্তায় জল আস্তে যাও।

২, ৭, ১৯৫৫

মৈলী তিস্তা

বাহাদুরদের কন্যা তিস্তা বাহাদুরাবাদ যাও।
তোমার সীমানা মেকলিগঞ্জে নেই। কী ক'রে দাঁড়াও।
শুনতে কি পাও উদয়ের দেশে গারো পাহাড়ের বাঁকে
রাজবংশীর মাদল বাজিয়ে ব্রহ্মপুত্র ডাকে।
যাও অভিসারে পার্বতী মেয়ে, ছাড়াও সীমা ছাড়াও
বাহাদুরদের মৈলী তিস্তা বাহাদুরাবাদ যাও।

সৈলী-কাঞ্চী জলঢাকা আর তোর্সা যমজ বোন
গীতালদহের সীমান্তে এসে মা'র আঁচলের কোন
খুঁজবেনা তারা, পথ চেয়ে আছে তোমারি অপেক্ষায়।
আরো দুই ভাই গারো পাহাড়ের মানিকের চরে যায়
মানিকের জোড় রায়ডাক-সঙ্কোশ। তিস্তা আগাও
বাহাদুরদের মৈলী কন্যা বাহাদুরাবাদ যাও।
২. ৭. ১৯৫৫

জানালাটা খোলা থাক

জানালাটা খোলা থাক
রাত্রির আকাশটা থেকে থেকে চমকাক
গুরু গুরু ডম্বরু বাজুক, কখনো বা পাখোয়াজ
বৃষ্টিরা না-ই এলে আজ।

জানালাটা খোলা থাক
আসুক বাতাস, দৃষ্টিরা যাক
বৃষ্টিরা ছিটিয়ে এসোনা
ঘরে মাথা খুঁড়োনা
সব চোখে বাইরের ডাক
জানালাটা খোলা থাক।

চোখে ঘুম নামেনি
চোখ-চাওয়া থামেনি।
জানালায় হানা দিয়ে
তবু চোখ গুটিয়ে
বসবার পরোয়ানা আনবে ?
জানালাটা বুজলেও, চোখ কি তা মানবে ?
সব চোখে বাইরের ডাক
জানালাটা খোলা থাক।

২৫, ৬, ১৯৫৫

চিঠিরা হারায়

পাঠাই আমার চিঠি অতীতের হস্তিনাপুরে
যুবরাজ অভিমন্যু কোন্ সে সুদূরে
বলি হয়ে ধন্য করে সপ্তরথী বেষ্টিত যৌবন।
অযোধ্যার সিংহাসন
বৃহদ্বল কোশলের সেই অপঘাতে
রাজ-শোক ক'রে সাথে সাথে
অভিমন্যুকে চুপে শ্রদ্ধা জানায়—
পাঠাই আমার চিঠি সেই অযোধ্যায়।

পাঠাই আমার চিঠি সেদিনের মিথিলায়
বহুলাশ্ব জনকের আমাত্য সভায়
চম্পারণ্য দেশে।
পাঠাই আমার চিঠি মগধ উদ্দেশে
জরাসন্ধের ঠিকানায়
পাইনা উত্তর শুধু চিঠিরা হারায়।

মহাভারতের কবি দ্বৈপায়ণ ব্যাস
ইতিহাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে কত উপন্যাস
ছড়ায়েছে আঠারো বন্দরে
পাঠাই আমার চিঠি সেই সব দেশ দেশান্তরে

পাঠাই আমার চিঠি মন্ত্রের গতিতে
অতীতের অনেক অতীতে
যেই যুগে শ্রুতিধর পরাশর ব্যাস
চারিবেদ ভাগ ক'রে করেন অভ্যাস।

আবার পাঠাই চিঠি কাছাকাছি সময়ের দেশে
যেইদিন রাম-সীতা-মিলনের আনন্দ আবেশে
শিরধ্বজ জনকের অন্তঃপুর হতে
সদানীর-গণ্ডকীর সঙ্গমের স্রোতে
হুলুধ্বনি মিশেছিল উচ্ছ্বসিত বানে।
শুক্ল যজু মন্ত্রের উদ্‌গানে
বাজসনী যাজ্ঞবল্ক্য আকাশে পাঠায় তার রেশ
সেখানে আমার চিঠি হয় নিরুদ্দেশ।

পাণ্ডবের ভাঙাহাটে দ্বৈপায়ন ব্যাসের আসরে
আরো এক যাজ্ঞবল্ক্য স্বর্পযজ্ঞে মন্ত্র পাঠ করে।
পাঠাই আমার চিঠি সেই ঠিকানায়
পাইনা উত্তর শুধু চিঠিরা হারায়।
২, ১১, ১৯৫৪

স্বর্গ-মর্ত্য

হর-গৌরীর ঝগড়ার কথা বলতে নেই।
তবুও বলব। ভগবানে নতি করেছি যেই
ভগবতী এসে প্রণাম কাড়েন তাঁহার আগে।
ভগবানও তাই। তারও ক্ষুধা ভগবতীর ভাগে।
কী আশ্চর্য ! প্রণামের লোভে এ আড়াআড়ি
অবশেষে করে প্রণত মাথার যে কাড়াকাড়ি
প্রমাণ তাহার ধনপতি আর ইছাই ঘোষ,
মগরায় আর অজয়ঢেকুরে রুদ্র রোষ।
কারো ভরাডুবি, কেউ দিল মাথা তলোয়ারেই।
হর-গৌরীর ঝগড়ার কথা বলতে নেই।

তবু সুন্দর স্বর্গে-মর্ত্যে যাওয়া আসা।
আকাশের বাড়ী হারিয়ে পেয়েছি মাটির বাসা
আবার ফিরেছি আকাশের দেশে। রত্নমালা
বাবার শাসনে স্বর্গ হারিয়ে নতুন পালা
শুরু করে দেয় এই পৃথিবীর খুল্লনাতে
ফিরে যায় ফের। তেমনি আবার জননীর হাতে
পেয়েছে বিদায় অম্বুবতীও স্বর্গ থেকে
এই পৃথিবীতে রঞ্জাবতীর কাহিনী রেখে
ফিরেছে আবার। মধুর গল্প যাতায়াতেই।
হর-গৌরীর ঝগড়ার কথা বলতে নেই।

এই পৃথিবীর খুল্লনা আর রম্ভাবতী
হয়ে গেছে ফের রত্নমালা ও অম্বুবতী
স্বর্গপুরীতে। (তবু এ মাটির দেশের কথা
স্বপ্নের মত পড়েনা কি মনে? নৃত্যরতা
নুপুরের তাল কাটে কি স্বর্গে স্মৃতির টানে?
এই পৃথিবীর পরিচয়গুলি সেখানে প্রাণে
তোলে নাকি ঝড়?) পড়েনা কি মনে রত্নমালা
লক্ষপতিকে বাবা ডেকেছিলে; বরণ-মালা
দিয়ে পেয়েছিলে স্বামী ধনপতি; তোমার কোলে
শ্রীমন্ত এলো? অম্বুবতীর মনে কি দোলে
ছিল বেণু রায় বাবা আর স্বামী কর্ণ সেন,
ছেলে লাউ সেন? মহামৃত্যুর যে অহিফেন
ভোলায়েছে সব, অমৃত বল সে বিষকেই?
হর-গৌরীর ঝগড়ার কথা বলতে নেই!

২৯, ১২, ১৯৫২

অবচেতনার কবি

যুগ যুগ অভিশাপে যেই মন পাথর-পাহাড়
অভ্যাসের জড়তায় বোবা ও বধির গুরুভার ;
তাহারও অতল গর্ভে যে আগ্নেয় নীরবে ঘুমায়
বঞ্চনার ক্ষোভ নিয়ে গোপনে গোঙায়
কবি তাকে ভাষা দাও
সুপ্তি ভাঙো, বিদ্রোহ জাগাও।
পাথর মনের লক্ষ পাহাড়ের শ্রেণী দেয় সাড়া
মাদলে মাতাল হয়, মাথা তোলে পাহাড়িয়া পাড়া
আধো-জাগা, আধো-ঘুমে ধূমায়িত বহ্নির রেখায়
রুদ্ধ অবচেতনের আগ্নেয় জীবন ভাষা পায়।

নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙে,ঘুম ভাঙে অবচেতনার
বন্ধন-গণ্ডীকে ভাঙে, আঘাতে আঘাত করে আর
প্রশ্ন করে অদৃষ্টকে, চারিদিকে কেন এ বাঁধন,
ছক-কাটা পথ বেয়ে অঙ্কুশে অভ্যস্ত আচরণ ?
প্রশ্ন করে বারবার ঘুম-ভাঙা ভোরে
কেন এ জীবন বাঁধা নিষেধের ডোরে ?
নিরঙ্কুশ মুক্তি চায় জগৎ প্লাবিয়া
বন্ধন-বিহীন গ্রন্থি দিয়া।
আমার তোমার তার
অবচেতনার
বিদ্রোহী নির্ঝর পথ চায়
শৃঙ্খল-বিহীন কোনও শৃঙ্খলায় ;—
কবি তাকে ভাষা দাও
অর্বুদ মনেতে তার ব্যঞ্জনা জাগাও ;

তোমার স্ফটিক জলে স্বচ্ছ ধারায়
কোটি গ্রহ-উপগ্রহ দেখে আপনায় ;
কবির নির্ঝরে দেখি নিজেদের ছবি
কবিকে আপন করি, আপনারে কবি।

সূর্যের শাসনে দগ্ধ উপরতলার বালুচর
তীক্ষ্ণতাপ, মরুভূমি আর মরুঝড়।
তবুও অনন্ত মোহ শানিত মার্জিত মহিমায়
আর তার শেষহীন অলংকৃত সে মরীচিকায়।
ভোঁতা, বোবা, চাপা-পড়া ফল্গুমন নীচের তলায়
মুক্তি চায় ক্ষুব্ধ স্রোত অবচেতনায় ;
কবি তুমি ভগীরথ তার
তোমার শঙ্খের ধ্বনি অবচেতনার।
আমার, তোমার, তার
সবাকার
ফল্গুমন সাড়া দেয়, অধীর আবেগে উপচায়
সূর্যজ্বলা উপর তলায়,
বিদ্রোহী স্রোতের আগে আগে
বালির যুগান্ত চাপ ভাঙে।

উপরতলার মন শক্তিমানের ভয়ে কাঁপে
আপনার অক্ষমতা তৃপ্ত দেখে পশুর প্রতাপে
পশুকে দেবতা করে ; বীরপূজা নাম দেয় তারে
স্বস্তিকার অক্টোপাশে বন্ধনের বোঝা রোজ বাড়ে ;
ড্রাগনের বিষাক্ত ছোবল আর
ঈগলের ধারালো ঠোঁটের ধার
বাঘ আর সিংহের থাবায়
অনেক ভয়ার্ত রাত কোরাস বাজায় ;
অসভ্যের ভয়ে সভ্য আমাদের মন
মুক্তি চেয়ে-চেয়ে করে আত্মসমর্পণ।

দৈনন্দিন অন্যায়ের দৈনিক ক্ষয়েরে মেনে মেনে
তিলে তিলে ভূতে পাওয়া অমাবস্যা এনে
অন্যায়ের প্রতি ক্ষুব্ধ যেই মন ভয়ে চুপ রয়
আর নিত্য সন্ধি করে, গা-সহা করিয়া লয় ;
অন্যায় করার মত অন্যায় সহার দায় ঝেড়ে
কবি তুমি ডাকে দিলে সংগ্রামী সে ঘরোয়া মনেরে
কবি তুমি ডাক দিলে সেই রুদ্র অবচেতনারে
দানবের মুখোমুখী দাঁড়াতে দুয়ারে।

দৈনন্দিন জীবনের ছা-পোষা বেচারা
বাঁচিয়া বাঁচিয়া মরে নিতি নিতি যারা
নির্বিকল্প নির্বিকার সুখে আর দুখে
তাহাদের সকলেরই মুখে
প্রশ্ন এক—'কেমন আছেন ?'
(ভাল থাকাটাই যেন প্রশ্নের বিষয়)
উত্তরও বৈচিত্র্যহীন দুটি কথা—
'কোনও মতে', 'কেটে যায়' 'যথা তথা'—
মোট কথা দিন কাটে, দাগ কেটে কেটে ঘায়ে ঘায়ে,
সে দাগও গোপনে রাখি সভ্যতার দায়ে ;
যে জুতোর তলা নেই, পা'র তলা ফুটপাথ ছোঁয়
তবুও সভ্যতা রাখি মেজে ঘসে সে ছেঁড়া জুতোয় ;
ভাল যে থাকিনা, তারে প্রকাশ করিনা, চালে চলি—
'কোনও মতে কেটে যায়', হয়তো বা 'বেশ, ভালো' বলি।
(মনের উপরতলা এমনি অভ্যস্ত)
মনের গভীরে জানি, ভাল লাগে নাকো কোনও মতে
মুক্তি চাই, প্রাণ চাই, যেতে চাই আরেক জগতে—
সে অবচেতন মন ভাষা পায় কবিকণ্ঠে গানে—
'হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে'।

৮, ৫, ১৯৪৬

এসো

এখনো দেখা পাইনি, তবু জানি—
তুমি আমার রানী
এই পৃথিবীর কোথাও জন্মেছ
হাসি কান্নায় বেড়ে উঠেছ
মায়ের ধমকে, বাপের আদরে।
ষষ্ঠি ডালার উনিশ বিশে মুখ ভার ক'রে
আবার পরম খুসীতে ভরেছ ভাইফোঁটার থালা।
শৈব্যা, সীতা, দময়ন্তী, চিন্তামনির পালা
শুনতে শুনতে কেঁদেছ
তবু শ্রদ্ধা করেছ।

ঝড়ের দাপটে, মেঘের ধমকে
বিদ্যুতের চমকে
স্মরণ করেছ, এমনি দুর্দিনে
এক বিজন বিপিনে
সত্যবানকে সাবিত্রী বাঁচিয়ে তুলল,
বেহুলা জীবন মৃত্যু ভুলল
অজানা ধনন্তরীর হাতে
লখীন্দরকে বাঁচাতে
অকূলে ভাসলো।

জানিনা
পড়েছ কিনা
রামায়ণ, গীতা
কিম্বা রবিঠাকুরের গল্পগুচ্ছ, সঞ্চয়িতা
আর শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

অথবা রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি
গুনগুন কর কিনা
জানি না।
তবু সীতা শৈব্যার গল্প শুনে
চিন্তা দময়ন্তীর দুখের দিন গুণে
যদি তাদের ভালবেসে থাকো
তবে এসো, হাতে হাত রাখো।

দুর্গাপূজায় সাত পাড়ায় আরতিতে গিয়ে
প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে
নিজেও যে এক প্রতিমা তা কি বোঝ ?
সরস্বতী, লক্ষ্মী আর দুর্গাকে কি খোঁজ
নিজের মধ্যেই ?
বাপের বাড়ীর তোমাতেই
রয়েছে কুমারী সরস্বতী।
ওগো শ্রীমতী
একদিন লক্ষ্মী হয়ে আবার আমার কাছে আসবে
সিঁথিতে সিঁদুর হাসবে।
তারপর কোলে গনেশ-কার্তিক নিয়ে
সংসারে দুর্গার মত দাঁড়িয়ে
তুমিই পূজা পাবে।
এই লক্ষ্মী ছাড়া ব্রহ্মাকেও বিষ্ণু সাজাবে
পরে শিবকে জাগাবে
আর সংসারে নামাবে
কৈলাসকেই।
ওগো শ্রীমতী প্রতিমা যে তোমাতেই

জীবনের এই আগু মধ্য উপাধির বৃদ্ধি
আনে যদি চেতনার শুদ্ধি
তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি
নামের শ্রী
না বাড়ালেও ক্ষতি নেই—
প্রতিমা যে তোমাতেই।

লক্ষ্মী ও উর্বশী—দুই মেয়ে সমুদ্রের।
ভিন্ন আদর্শের
দুই নারী
কেউ বা ঘরোয়া আর কেউ বা দুয়ারী।
কেউ বা সীতার মত ঘর-ছাড়া হয়ে
হৃদয়ে
ঘরেরই ধ্যান রাখে ;
কেউ বা রাধার মত আপনাকে
কিছুতেই ঘরে রাখতে পারে না।
কেউ বা নদীর মত সাধারণের দেনা
শোধ করে ;
কেউ থাকে ঘরে
মঙ্গলঘটের মত সংসারের শক্তি-উৎস হয়ে
সুখে দুখে জয়-পরাজয়ে
এমনি শক্তিই যদি থাকো
এসো তবে হাতে হাত রাখো।
নাটকে ও নাচঘরে উর্বশীর মত
শিল্পের পরিচয় দিতে ইতস্তত
লক্ষ্মীদের হবেই।

তুমি যে নিজের আসনেই
টেনে আনবে গোটা গ্রাম
আর সবার মুখে শুনবে নিজের নাম।
ঘরে বসেই প্রণাম যদি পেলে
হাত তালি পেতে মঞ্চে নাই বা গেলে।
দৃষ্টির অগোচরেই থাকেন ভগবান
টেবিল চাপড়ে তাঁকে শক্তির প্রমাণ
দিতে হয় না।
রাজাও স্বয়ং লয় না
নিজেই পাড়ায় পাড়ায়
ঢেড়া পিটিয়ে আইন ঘোষণার দায়।

ওগো শ্রীমতী
যদি থাকে স্বাস্থ্যের জ্যোতি
বর্ণ গন্ধ না হয় নাই বা মাখো
এসো এসো হাতে হাত রাখো।
দেহকে ফোলাতে হয় না কুঁচি দেওয়া সায়ায়
কিম্বা ব্লাউজের জানালায়
চোখকে নিমন্ত্রণ করার
কোনও দরকার
পড়ে না ;
কেননা যৌবন দেহে ধরে না।
সরস্বতী যেতে চায়
লক্ষ্মী হয়ে দুর্গা প্রতিমায়,
ভ্রূণের বাঁচার রসে গুরুভার
নিতম্বের আজানু প্রসার,
বুকেও দুধের উৎস। এ যৌবন
মাতৃত্বেরই আয়োজন।

সংসারের কর্ত্রী মায়েরাই, চাবি তাঁর হাতে।
পিতা শুধু কর্মকর্তা সেই অনুপাতে।
যে মেয়ে স্বামীর ঘরে যায়
তারই জায়গায়
পুত্রবধূ মেয়ে হয়ে আসে ;
যেমনি সে মা হয়, কোলে শিশু হাসে
সংসারের কর্ত্রী-মাও চাবি তাঁকে দিয়ে হয়ে যায়
নাতির খেলার সাথী। এমনি ধারায়
যুগ যুগ ধরে
মা থেকে নতুন মায়ে সংসারের শক্তি-কেন্দ্র সরে
বিশ্বের শক্তিকে তাই
মা বলেই পাই।
যে যৌবন
এই মাতৃত্বেরই আয়োজন
অভিসারে তার অপলাপ
লক্ষ্মী নয়, উর্বশীর পাপ।
তাকে আমি চাই নাকো
এসো লক্ষ্মী হাতে হাত রাখো।
১৪,১,১৯৫৪

তিনি

পাহাড়িয়া বনে ঘেরা জলপাইগুড়ি
সেই দেশে দলমোরে চা পাতার কুঁড়ি
অরেঞ্জ পিকোর ঘ্রাণে উতল যখন
নামল একটি মেয়ে মাটিতে তখন।

সোমবারে সোমদেব কবিতা দিয়ে
একটি মেয়ের প্রাণ দিল গড়িয়ে।
সূর্য প্রখর বাণ লুকিয়ে তূণে
ধনুতে সেতারী সুর গিয়েছে বুনে।
বৃশ্চিক রাশি থেকে চাঁদের আলো
খুসী হয়ে মেয়েটিকে বাসলো ভালো।
হাসলো মেঘের পাড়ে একটি তারা
বৈশাখী রাত্রির পূর্বাষাঢ়া।

আরেক বালক ছিল অনেক দূরে
গারো পাহাড়ের দেশে গৌরীপুরে।
আমকাঁঠালের ছুটি তখন তাকে
পাঠশালা থেকে দূরে খুসীতে রাখে
সেদিনের সে খুসীতে ছিল লুকিয়ে
আরো এক খুসী কারো জন্ম নিয়ে।
প্রজাপতি খেলে সেই সন্ধ্যারাতে
সাড়ে আট বছরের ছেলের সাথে।

কৃষ্ণনগর মৃৎশিল্পের ঠাঁই
স্যাঁকরা পাড়ায় সেথা সোনার ঢালাই
তার চৌরাস্তায় গৃহপ্রবেশের
উৎসবে মাতে মেয়ে দশবছরের।
প্রজাপতি বলেছে কি তাহার কাছে
তার বর ময়মনসিংহে আছে ?
অজান্তে তবু তার নাচত ভুরু,
বর তার বি, এ, পাঠ করেছে শুরু ।
প্রফেসর বাদ দিয়ে প্রথম সেবার
ছাত্রটি ম্যাগাজিনে হল এডিটার।
রাজরোষে সেই কবি মরছিল ভুগে
চেম্বারলেনী সেই যুদ্ধের যুগে।

বি, এ, পাশ করে কবি কলকাতা এসে
প্রত্যহ-দৈনিকে হেঁতুয়ার প্রেসে
সম্পাদকতা কাজে হয় তৎপর
ষোড়শী জানেনি তবু এই তার বর।
ষোলকলা যৌবনে নব অনুরাগে
মেয়েটি যায়নি কেন হেঁতুয়ার বাগে ?
সেখানে বেড়াতে গেলে হয়ত তখন
চিনে নিত এই কবি আপনার জন।

সম্পাদকীতে কবি ইস্তফা দিয়ে
ফিরে গেল দেশে এক মাষ্টারী নিয়ে
শিক্ষকতার কালে এম,এ, পড়বার
কিছুই হোলনা শুধু আরম্ভ সার।

জননী বিগড়ে গেল সূতিকা রোগে
জন্মভূমিও গেল খোদার ভোগে
এর মাঝে কোনো এক মোহিনী ফাঁদে
কবির কেটেছে কাল আর্তনাদে।

কৃষ্ণনগরে দেশ ভাঙানো ঝড়ে
মেয়েটি যখন নারীবাহিনী গড়ে
মাষ্টারী ছেড়ে কবি জুটল এসে
ফের কলকাতা লোকসেবক প্রেসে।
সে বছর মেয়েটির দরজা দিয়া
এই কবি গিয়েছিল আন্দুলিয়া।
মেয়েটা দেখেনি কেন, সে-অনুতাপে
গান্ধারী হয়ে কিছু দিবস যাপে।

চোখ গেল পাখীটার চোখ জুড়ালো,
গান্ধারী মেয়েটাও দেখল আলো।
কবি পরিসংখ্যানে চাক্‌রী নিয়ে
হাঁসখালি গেছে তারি দরজা দিয়ে।
মেয়েটা দেখেনি তবু। দেখল সে বর
যেইবার এল কবি কৃষ্ণনগর
জীবনের সঙ্গিনী পাবার আশে
একষট্টীর সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে।
৩০. ১০. ১৯৫৫

সংযোজন

প্রাণবসন্ত

থেকে

প্রথম প্রকাশ

আশ্বিন, ১৩৫২

আলো-ছায়া

সাত-সমুদ্দুর পারে রূপোর কাঠির ছোঁয়ায়
একান্ত আমারি অপেক্ষায়
সুন্দরী সে রাজকন্যা চাঁপার বরণ
ঘুমে অচেতন।
সোনার কাঠির ছোঁয়া দিয়ে
একদিন সুপ্রভাতে তার ঘুম ভাঙিয়ে
বরণ ক'রে আনব ঘরে
বুড়িকে মেরে মরণ কৌটা চুরি ক'রে।

সত্যিকার সমুদ্র যাত্রায়
সবুজ শুকানো শীতে গাঢ় কুয়াসায়
চির চেনা পথ হল ভুল—
সব হারা অতল অকূল।
নেমে এ'ল 'এনসেণ্ট-ম্যারিনার'
জীবনে আমার।
গেল নিয়ে
কত ভয় আশংকায় ভাসিয়ে।
পুরণো পিপাসা আছে
আর সীমাহীন জল আছে কাছে
—জল, জল শুধু নোনা জল
ছাতি ফাটা পিপাসায় নেই তার এক ফোঁটা ফল—
মৃত্যু, শুধু মৃত্যু আছে চারি পাশে পড়ি'
আর আমি রোজ রোজ মরি।

আজ মনে হয় ঃ
আমার আজের চোখ সেই চোখ নয়
এই পৃথিবীর বুকে অনেক ঋতুর খেলা
দেখেছি মেলা
সেই চোখ দিয়ে।
সেই চোখ গিয়েছে হারিয়ে।
চির বসন্ত নয়
গ্রীষ্ম রয়
সারাটি বছর,
আর জীবনের সাথী ঘুনে ধরা জ্বর।
পুরাতন অভিশাপে
পরিশ্রান্ত রক্তের উত্তাপে
কপালের ঘাম ফেলে রুটীর জোগাড়
বারমাস সেই ঘাম আর
চির গ্রীষ্ম রয়
আমার আজের চোখ সেই চোখ নয়

তোমাদের পৃথিবীর ব্যস্ত আঙিনায়
অনেক ভুল, অনেক মিথ্যা অনেক অন্যায়
তোমাদেরে মন থেকে তাই করি ঘৃণা ভয়,
আর বার বার থেকে থেকে মনে হয় ঃ
তোমাদের পৃথিবী থেকে দূরে কোথাও স'রে পড়ি
সেখানে একটা নিজের জন্যে মনের মতন পৃথিবী গড়ি।

এই 'ম্যাডেনিং ক্রাউড' থেকে অনেক দূরে
কোন একটা স্তব্ধ পাহাড়ের উপুরে

যেখানে উঁচু টিলা স্তব্ধ স্থির
আর মাঁচায় তোলা একটি ছোট্ট কুটীর
যেখানে পাহাড়িয়া ফুলের গন্ধ বাতাসে
যেখানে ঝর্ণার স্বচ্ছ শব্দ কানে আসে
যেখানে অনন্ত ছবির রীল চারিপাশে
আর তারই ছোঁয়া যে আমায় ভালবাসে
আর মহুয়ার রসে যেথায় মাতাল মন
তেমনি পৃথিবীর মতন।

এও স্বপ্ন ! এমন ত কখনো হয়নি
যেমন কোন রাজকন্যাও ঘুমিয়ে রয়নি
রূপোর কাঠির ছোঁয়ায়
সাতসমুদ্দুর পারে আমার অপেক্ষায়।
এই মানুষেরই হাটে আমার স্থান
আমি যা চাই তারই মান
যাচাই হবে এখানে—এই পৃথিবীর হাটে
নোঙরহীন নৌকায় মিছে ছুটি পাতালপুরীর ঘাটে।
আমিও একা নই—আছি আমি তুমি সে
আমারই মতন আরও অনেকে।
আমি হয়েছি আমরা
আমাদের বাসস্থান নীচের তলার কামরা,
মরচে পড়া জানালাটা খুলেছি
দিগন্তের আশায় ভুলেছি।

চেয়েছি দিগন্তের সীমা !
যেখানে আকাশের নীলিমা

পৃথিবীর সবুজে এসে
মেশে !
বর্তমানের গ্লানি বুভুক্ষা যখন
দুর্বিষহ ক'রে তোলে জীবন ও মন
তখন তোমারি দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতকে খুঁজি
আর বর্তমানকে বুঝি !

পথে প্রান্তে মুমূর্ষু ক্ষুধাতুর
বর্তমান আজ প্রসব-ব্যথাতুর
তার গর্ভ থেকে জন্ম নেবে সুশ্রী ভবিষ্যৎ
তৃপ্ত যেথায় রাহু ও মন্মথ।
দিগন্তেই ক্লান্ত বর্তমানের সূর্যাস্ত হয়।
দিগন্তেই জাগে নতুন ভবিষ্যতের সূর্যোদয়।
নিঃশেষ করেছি বর্তমানের পুঁজি
দিগন্তে তাই ভবিষ্যতকে খুঁজি।

১২, ১১, ১৯৪১

নীল পাহাড়

উত্তর আকাশের গারো হিল
নীল পর্দার গায়ে গাঢ় নীল।
নীলে নীলে দিগন্ত ঢাকল
আমার চোখের বিলে
স্বচ্ছ নীলের ছায়া রাখল
দূর থেকে ডাক দেয় সেই নীল
উত্তর আকাশের গারো হিল।
কাছে যাই পাহাড়ের খুব কাছে
দূরে দূরে সরে যায় সে পাছে
তারপর নীল হিল হারাল
কালো পাহাড়ের স্তূপ দাঁড়াল।
গিরিপথে কংকর
শাল বনে মর্মর
তুলল
সুনীলের ছবি মন ভুলল।
পৃথিবীর বুকে চাপা সৃষ্টির উদ্বেগ
স্তূপ হয়ে উদ্ধত উঠল,
ঝর্ণায় সে-আবেগ ফুটল।
নীলিমার সাথে তার নেই মিল
উত্তর আকাশের গারো হিল।

২, ৩, ১৯৪৫

পরিক্রমা

গ্রীষ্মের রৌদ্রের নিশ্বাস
শুষে নেয় সৃষ্টির নির্যাস।
আকাশেতে শুষ্ক এ-পৃথিবীর কংকাল
ছায়া ফেলে এলো মেলো কালো কালো মেঘজাল
রৌদ্রেতে মেঘেদের ত্রাস।

গ্রীষ্মের রৌদ্রের হল্‌কায়
আকাশের প্রান্তর ঝল্‌কায়;
ভূখায় এ-পাশ ভরে
মেঘে মেঘে ভীড় করে
সমাবেশে সংহত আশ্বাস।

মেঘ আর রৌদ্রে আকাশ
বিরোধের দ্বন্দ্ব-সমাস।
রৌদ্রই লেলিহানে
মেঘেদের ভীড় আনে
আনে তার প্রতিবাদ বর্ষা।

মেঘেদের গর্জনে, বিদ্যুৎ-বিদ্রোহে
বর্ষার বন্যায় ঝড়-জল সমারোহে
দেখা দেয় ক্লান্তির
ফুট্‌ফুটে শান্তির
শরতের ঝক্‌ঝকে ফর্শা।

৪, ৩, ১৯৪৫

জাহাজের ডাক

বন্দরে জাহাজের ডাক।
প্যাগোডার গম্বুজে
ঘাড় নেড়ে চোখ বুঁজে
অভিজাত পায়রার
পৈত্রিক পরিবার
বসে থাক।
বন্দরে জাহাজের ডাক

মনের মাটিতে এসে সমুদ্র আছড়ায়
আকাশকে ফুঁড়ে যায়
ঘর ছাড়া বলাকার ঝাঁক।
বন্দরে জাহাজের ডাক॥
অঞ্চল উড়ালো দিগন্ত
যাযাবর বলাকা দুরন্ত
উড়ন্ত এক ঝাঁক ভীড়
গুণ টানা এক তূণ তীর
আকাশকে ফুঁড়ে যায়
দূরে যায়, উড়ে যায়, দূরে যায়।

যাযাবর বলাকারা দুর্বার
পায়রার পরিবার
বসে থাক॥
৩, ৩, ১৯৮৫

যৌবন

মাটির কবরে মরা অরণ্যের থম্‌থমে
কয়লার শোকের পাহাড়ে তবু
আরণ্যক জীবন্ত সবুজ আর
মর্মর কাকলী আর রক্তিম স্তবক
ঘনিষ্ঠ জমাট বেঁধে
বলিষ্ঠ হীরকখণ্ডে ঝলমল যে যৌবন
গড়ে তোলে প্রগাঢ় প্রতিমা—
যোগ করি সে-জীবনে আমার জীবন
রক্তে আনি বিদ্যুৎ প্রবাহ আর
সে-প্রবাহ সমাজের যন্ত্রেতে ছড়াই
চলন্ত যন্ত্রের ধ্বনি মন্ত্র হয়ে ওঠে
যে-মন্ত্রে জীবন তন্ত্র স্তব করে শাক্তের শক্তির !
কন্যা কুমারিকা তুমি গৌরী হয়ে ওঠো
সমুদ্রের উচ্ছিষ্ট হোয়োনা আর
নামাও শক্তির গঙ্গা সমুদ্রের বুকে
নিয়ে এসো সাগরের পুনরুজ্জীবন,
চুম্বনের অজস্র প্রণামে আর
আমার বুকের স্পর্শে সম্মানিত করি ।

২১. ৬. ১৯৪৫

প্রাণ-বসন্ত

আমাদের মৃত্যু নেই
মৃত্যুপণ আছে।
সবল হাতের পেশী
জীবনেরে খুঁড়ে তোলে
মাঠে মাটিতে
সে-জীবন দুহাতে ছড়াই।
জীবনেরে জন্ম দেই উদ্গত অংকুরে
সবুজের জীবন্ত শিখায়
প্রান্তে আনি সোনার স্বপন
ফলন্ত ধানের ছড়া।
সোনালী তূষের থেকে
খুঁটে তুলি নবান্নের ক্ষুদ্
—দুই হাতে জীবনের অনন্ত মরাই
সে-জীবন দুহাতে ছড়াই।
আমাদের মৃত্যু নেই
আমরা জীবন।
জলে ভাসা হেলেঞ্চার লতানো সবুজে
সে জীবন নেই,
স্রোতে পাওয়া খাড়া করা কচুরির সবুজ পাতায়
তুলে ধরা সবুজের পালে,
ফুলের মাস্তুলে,
সে-সবুজে এ-জীবন নেই।
—ঘোলা জলে পালের বাতাসে,
বয়ে নিয়ে যায় মারী
বাঁকে বাঁকে গাঁয়ে।

সন্দেহের সন্ধ্যা তবু নামে,
অন্ধকারে পাতাঝরা মরা বন হাত তোলে ;
এলোমেলো কংকালের অগণিত হাত।
একদিন এই বনে সবুজ পাতারা
হাত পেতেছিল আর পেয়েছিল মোর কাছে
আমার প্রথম প্রেম
দিয়েছিল অরণ্য-আস্বাদ আর
সে অরণ্যে হারাবার নেশা ;
আস্তীর্ণ দূর্বায় আর তৃণের শিখায়
জীবনের সবুজের আশীর্বাদী রং,
সে সবুজে মুখ ঘসে জীবনের সোনার হরিণ
সেই মরা ঘাসে আর পাতা ঝরা বনে
সন্দেহের ছায়া সন্ধ্যা নামে।
খাঁচার সবুজ টিয়া
বেড়ে ওঠে মুখ রেখে উচ্ছিষ্ট পেস্তায়—
—পেস্তার সবুজে।
বন তার ছিলনাকো
মরা বন সে পাখীর গানে।
আমরা বনের যারা, যাদের এ-বন
তারা জানি এ অরণ্যে—
মরা ঘাসে পাতা-ঝরা বনে
ঘুরে আসে সবুজ জোয়ার
শীত শেষে বসন্ত আবার।

১০, ৬, ১৯৪৫